প্রথম আলো

তারিখ ... 24 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা দশকের ঘোষণা চাই

শি ক্ষা ব্য ব স্থা

আবুল মোমেন

প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে—নানা পরিসংখ্যান বলছে, তা ৯৭-৯৮ শতাংশ হবে। তবে প্রাথমিকের শেষ পর্যায়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ২০ ভাগের মতো ছাত্রের ঝরে পড়া উদ্বেগজনকই বলতে হবে। স্কুলের দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব ছাত্রই বছরের প্রথম দিন বিনা মূল্যে বই পাচ্ছে। মেয়েদের জন্য বিশেষ সুবিধাগুলো তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ এক বিরাট অগ্রগতি। শিক্ষামন্ত্রী, মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাই এর জন্য ধন্যবাদার্হ।

এখন আমাদের করণীয় হলো শিক্ষার মান বাড়ানো এবং ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা। সরকারি জরিপেই দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিকে লক্ষ্য পূরণের হার বেশ হতাশাজনক। কারণ, এ পর্যায়ে আদতে সবারই প্রায় সমমাত্রায় অগ্রগতি হওয়া দরকার। তবে আশার কথা, মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সচেতন। এর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় নানা রকম ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনও প্রণয়ন করেছে। এই সূত্রে দু-একটি ভাবনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

আমাদের স্কুলশিক্ষা সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই বস্তুত মুখস্থবিদ্যার কারবার। এটা পরীক্ষায় ভালো ফল আদায়ে কার্যকর বলে প্রমাণিতও হয়েছে। ইদানীংকালে, বিশেষত গত দুই দশকে, সম্পূর্ণ স্কুলশিক্ষাই পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। আমাদের দেশে বরাবর প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি থাকায় তাদের প্রয়োজনে গৃহশিক্ষক, বাড়তি কোচিং এবং নোট বইয়ের প্রচলন হয়েছে। ক্রমে এটা স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠেছে। আর একালে পরীক্ষার ফলাফলই শিক্ষাজীবনের সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ানোয় এ নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়ে স্কুলবহির্ভূত উৎস থেকে কেবল পরীক্ষাকেন্দ্রিক পাঠগ্রহণের এক বিশাল বাণিজ্যের পথ খুলে গেছে। অনিশ্চিত ফলাফলকে সন্তানের জন্য নিশ্চিত করতে সম্পন্ন অভিভাবকেরা বড় অঙ্কে প্রয়োজনাতিরিক্ত বিনিয়োগে পিছপা হচ্ছেন না। শিক্ষার এই পণ্যায়নের সুবিধা অন্যরাও নিচ্ছেন—শিক্ষক, লেখক, প্রকাশক তো বটেই, এমনকি প্রশ্নকর্তা, মডারেটর বা মুদ্রাকর, পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রশাসক বা খুদে কর্মী, কেউই বাদ যায়নি।

আজকে কোনো ছাত্রই বলতে পারবে না যে কোনো স্কুল ও বাড়িতে পড়েই তারা পরীক্ষা দিয়ে থাকে। যে শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের গোড়া থেকেই পরীক্ষার্থীতে রূপান্তর করে নেয়, তার অংশীদার থেকে সফল হয়ে কোচিং-গাইড বই-নোট বই সংস্কৃতির বাইরে থাকার উপায় নেই বা সাহস কেউ দেখাতে যায় না। একইভাবে বলা যায়, এমন কোনো সফল স্কুলশিক্ষক পাওয়া কঠিন হবে, যিনি কোচিং-বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। আজকে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্দান্ত ফলাফলের জন্য দেশের বিখ্যাত বেসরকারি স্কুলে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে সেখানে পড়াশোনা মানে নানামাত্রিক পরীক্ষা—শ্রেণি পরীক্ষা, বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, ষাণ্মাসিক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি। কোচিং সেন্টারেও চলে নিরন্তর মডেল টেস্ট। অর্থাৎ এভাবে ছাত্রদের পরীক্ষায় দক্ষ করে তোলা হয়।

আর ঐতিহ্যবাহী সব সরকারি স্কুলে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে স্কুলে পঠনপাঠন নেই, কক্ষের এবং আসবাবের অপ্রতুলতার পাশাপাশি একজন শিক্ষকের অনুপাতে শ্রেণিতে ছাত্রসংখ্যাও অনেক বেশি বলে যথাযথভাবে পড়ানোর উপায়ও নেই। তা ছাড়া সবাই জানে পড়াশোনা হবে কোচিং সেন্টারে। ফলে স্কুলে পড়াশোনা তো বাহুল্য। বেসরকারি স্কুল ছাত্র উপস্থিতিসহ শৃঙ্খলা ঠিক রাখে মূলত ছাত্রদের ওপর নানা রকম পরীক্ষার প্রবল চাপ চাপিয়ে দিয়ে। এভাবে কোচিং, গাইড ও নোট বই এবং পরীক্ষার নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করার মধ্যে আমাদের শিক্ষা বৃত্তাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সংকীর্ণ—অল্পবিস্তর লেখাপড়া জানা, কিন্তু জ্ঞানের শক্তি এতই যে তারই ফাঁক গলে বিদ্যাসাগরসহ অনেক জ্ঞানী-গুণী আমরা পেয়েছি। দুর্ভাগ্য এখন লক্ষ্য আরও সংকীর্ণ—কেবল ডিগ্রি, জিপিএ-৫ অর্জন, জ্ঞানচর্চার সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং-গাইড-নোট বইয়ের ত্র্যহস্পর্শ দূর করার জন্য আন্তরিকভাবেই তৎপর হয়েছে বলে মনে করি। কোচিং, নোট বই ও গাইড বইয়ের বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে সরকার। শুধু বলব, অতীতেও এ নিয়ে কঠোর শাস্তির বিধানসহ আইন ছিল, হয়তো তা এখনো বলবৎ রয়েছে, কিন্তু এটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই আমাদের স্কুলশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে কোচিং-নোট-গাইড বাণিজ্যের হাতে জিম্মি হয়ে গেছে। আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে হয়তো পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে, কিন্তু তাতে আমাদের মূল লক্ষ্য মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রচলন নিশ্চিত করা যাবে না। বরং শিক্ষার সংকীর্ণ লক্ষ্য বহাল থাকলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে, আইন প্রয়োগকারীদের আয়ত্তে এনে তলে তলে অব্যবস্থা চলতে থাকবে। তাই বলব, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নের কাজ এবং স্কুল ও পাঠ্যবই ভিন্ন অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। এ-ও মনে রাখতে হবে, আমাদেরই ঔদাসীন্যে ও সময়োচিত পদক্ষেপের অভাবে এই অব্যবস্থা আজ শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ধারণা, পরিস্থিতি ও বাস্তবতা ভালোভাবে অনুধাবন করেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

গত ২০ বছরের মধ্যে এসএসসি পাস করা এমন কোনো মেধাবী ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে না, যারা এক বা একাধিক কোচিংয়ে যায়নি, এক বা একাধিক নোট-গাইড বই ব্যবহার করেনি। এদের মধ্যে খুবই দুষ্প্রাপ্য হবে কোনো ছাত্রছাত্রী পাওয়া, যারা নিজেরা নিজের নোট তৈরি করেছে। এই সূত্রে প্রায় ঢালাওভাবে বলা যায়, সব অভিভাবক, শিক্ষকও কোনো না-কোনোভাবে এতে অংশ নিয়েছেন; তাঁরা এর সুবিধাভোগী। ফলে আজ এটা একটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এটি যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়, তা বোঝা যায় যখন দেখি এ দেশে প্রকৃত জ্ঞানচর্চার কদর নেই, সাধারণভাবে প্রয়োজনও নেই, এমনকি সমাজের ক্ষমতাবান উচ্চমহলের কাছে স্বাধীন বুদ্ধিজীবী তথা সুশীলসমাজ উপহাসের পাত্র হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজের অবজ্ঞা অস্পষ্ট নয়। এই মনোভাবের প্রভাব পড়েছে সমাজের সর্বমহলে, উচ্চশিক্ষার স্তরেও। সেখানেও ছাত্ররা কেবল আসন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর শেখে, টেক্সট বই পড়ে না, এমনকি সাহিত্যও নয়। আর মুষ্টিমেয় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া উচ্চশিক্ষার অধ্যাপকেরা ছাত্রজীবনের পরে পড়াশোনার পাট সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় আছেন, যেমন সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক তাঁদের মধ্যে আজ আর নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণের কোনো আগ্রহ দেখা যায় না।

তাহলে আমরা যে কথায় কথায় বলি, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলব, সেটা কীভাবে হবে? জ্ঞানের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে সেটা কি সম্ভব?

আমার মনে হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারলে ব্যত্যয়গুলো নিয়ন্ত্রণে আসবে। কারণ, ত্র্যহস্পর্শের দুষ্টচক্র আজ শিক্ষার বিকল্প এবং প্রধান নিয়ন্তা হয়ে উঠলেও তা বস্তুত আমাদের অব্যবস্থারই উপজাত, অনেক সময় প্রতিক্রিয়াজাত। তাই সঠিক অবস্থা এত গুরুত্বপূর্ণ। কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা বিস্তারিত বলার জায়গা পত্রিকার কলাম নয়। তবে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া যায়।

২০১৬ থেকে ২০২৫—এই ১০ বছরকে শিক্ষা দশক ঘোষণা এবং শিক্ষাকে এ সময় জাতীয় অগ্রাধিকার খাত গণ্য করা যায়। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে এর জন্য দেশি-বিদেশি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এক দশকের উপযুক্ত বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। প্রথম পাঁচ বছরের লক্ষ্য হবে প্রাথমিক শিক্ষাকে ঠিক করা। প্রথমে একে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষকসহ জনবল, পাঠাগার, মাঠসহ অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সমাজের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের—যেমন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, উৎসাহী পেশাজীবী, সংস্কৃতি সংগঠক প্রমুখকে—নিজ নিজ এলাকার স্কুল তদারকিতে যুক্ত করা প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে, কেবল প্রশ্নের উত্তর শিখে কেউ শিক্ষিত হয় না, এমনকি শুধু পাঠ্যবই পড়েও শিক্ষিত জাতি তৈরি করা যাবে না। জ্ঞানের পরিধি আরও ব্যাপ্ত, গভীর হতে হবে, যাতে শিক্ষিত ব্যক্তির ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা তীব্রতা পায়, কার্যকর হয়। আবার কেবল বই পড়েও মনের সব দরজা খোলে না, আরও সব উপাচার যোগ করা চাই—সুর, অভিনয়, আবৃত্তি, সৃজনশীল রচনা, খেলাধূলা ইত্যাদি। এসব বিষয় এক মানুষকে তার দেশ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে, দেশপ্রেম খাঁটি হয়, সাংস্কৃতিক বোধ সঠিক হয়। সবার জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ ও পরিবেশ থাকতে হবে। দশকের পরবর্তী পাঁচ বছরে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে একইভাবে।

এভাবে যদি আমরা মাধ্যমিক পর্যন্ত সব শিশু ও তরুণকে মানসম্পন্ন উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি, তবেই আমাদের মূল যে সম্পদ মানুষ, তা সত্যিকার অর্থে মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে। বিদেশের বাজারেও আমাদের মানুষের দাম বাড়বে। শিক্ষা নিয়ে আজকাল সবাই ভাবছেন, বিশেষত ভালো শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এটা আশার কথা। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বলব, শিক্ষা নিয়ে এ দেশে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে। অধিকাংশ সময় তা ভালো ফল দেয়নি। আমরা দেখছি, শিশু ও শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগবিহীন, অভিজ্ঞতাহীন নানা বিশেষজ্ঞ নানাভাবে নীতিনির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করেন। তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক উদ্ভট ঘটনা ঘটছে। ছাত্ররা এতে ভুগছে, জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মনে রাখা দরকার, প্রাথমিক শিক্ষাই ভবিষ্যতের মানুষটির ভিত্তি তৈরি করবে, ফলে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করে ধীরে ধীরে এগোনোই ভালো।

● আবুল মোমেন: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।